Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-I, published on January 2023, Page No. 8 –16
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

মঙ্গলকাব্যে বাস্তুনির্মাণ, নগর নির্মাণ ও পরিবেশ ভাবনা

VASTU CONSTRUCTION, CITY CONSTRUCTION AND ENVIRONMENTAL THINKING IN MANGALKAVYA

রূপায়ণ রায়
গবেষক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : rupanureep869015@gmail.com

Keyword
Construction, Ecology, Ecosystem, Tree planting, Construction of reservoirs, Temple construction, Wildlife sanctuary, Mangalkavya.

Abstract
In this essay I will highlight how environmental awareness has been seen during the construction of Vastu, Nagar or Temple in the Mangalkavyas. Environmental awareness is a phrase of the modern age that modern people began to think seriously in the second half of this nineteenth century. In the second half of the 20th century, this issue became so important that a world-wide environmental stir was created. This issue of environmentalism has also emerged in medieval Mangalkavya. This issue of environment protection also come up in the context of that time. Although the literature of that time was mainly religious, in several parts of the story the poets have presented various information related to the environment while maintaining their social awareness. Therefore, the relationship between humans and nature-environment has been going on since ancient times and the middle ages is no exception. And of course the issue of ecosystem has also come up.

Discussion
'বাস্তু' শব্দটির অর্থ 'বাসস্থান', 'বাসগৃহ' বা 'বসতবাড়ি'। সংস্কৃত 'বস্' ধাতুর সঙ্গে 'তু' প্রত্যয় যোগে শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। ইংরেজিতে শব্দটি ইকোলজি। 'ইকোলজি' (Ecology) শব্দটি হেনরি ডেভিড থোরো (Henry Devid Thoreau) ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ব্যবহার করেন। কিন্তু শব্দটির সঠিক ব্যাখ্যা তিনি স্পষ্ট করেননি। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী আর্নেস্ট হেকেল (Ernst Haeckel) প্রথম ইকোলজি শব্দটি বর্তমান অর্থে ব্যবহার করেন। ইকোলজি শব্দটিতে রয়েছে দুটি গ্রিক শব্দ 'Oikos' এবং 'Logos' যার অর্থ বাসস্থান সম্পর্কিত জ্ঞান। এ প্রসঙ্গে 'ইকোসিস্টেম' শব্দটিও উল্লেখযোগ্য। 'ইকোসিস্টেম' বা বাস্তুতন্ত্র হল কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের জীবগোষ্ঠীর সঙ্গে সেখানকার ভৌত বা প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্পর্ক। যেখানে বায়োটিক এবং অ্যাবায়োটিক উপাদানগুলির মধ্যে পুষ্টিচক্র ও শক্তি প্রবাহ চালিত হয়।

অন্যদিকে সংস্কৃত সাহিত্যের 'তৈত্তিরীয় আরণ্যক'এ 'শহর' অর্থে 'নগর' শব্দটির উল্লেখ দেখা যায়। নগর শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'city' বা 'town', একে 'urban' বলা হয়। সুইডিশরা নগর বলতে 'Tatort' শব্দ ব্যবহার

করে, যেখানে ২০০ জনের বেশি মানুষ বসবাস করে এবং বাড়িঘরগুলো পরস্পর থেকে সর্বোচ্চ ২০০ মিটার ব্যবধানে অবস্থিত।[১] অনেকের মতে 'urban' অর্থাৎ 'নগর' শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ 'Orbis' এবং গ্রিক শব্দ 'Gorod' থেকে।[২] 'বাস্তু' বা বাসস্থান বা ইকোলজি এই সবগুলি পরিভাষাকে গভীর অর্থে ব্যবহার করলে আমাদের একমাত্র বাসযোগ্য স্থান পৃথিবীকে ভাবা যেতে পারে।

আদিম যুগে মানুষ বনে জঙ্গলে পাহার পর্বতের গুহায় গাছের কোটরে রাত্রি যাপন করেছে। ধীরে ধীরে সে দল বাঁধতে শিখেছে। শিকার করতে শিখেছে। কৃষিকাজ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করেতে শিখেছে। মানুষের বিবর্তনের ধারায় লক্ষ লক্ষ বছর এভাবেই কেটে গেছে। নগর সভ্যতার বিকাশ আমরা দেখতে পাই দশ-পনের হাজার বছর পূর্বে। এই নগর সভ্যতাগুলির মধ্যে সুমেরীয় ও হরপ্পা সভ্যতা উল্লেখযোগ্য। হরপ্পা সভ্যতা বৈদিক পূর্ব নগর সভ্যতা। বৈদিকগণ পশুপালন তথা যাযাবর জীবন যাপন করতেন। নগর সভ্যতা নির্মাণের জন্য যে স্থায়িত্ব প্রয়োজন তখনও তারা তা পাননি। ১৭৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হরপ্পা সভ্যতার পতন ঘটে বলে ঐতিহাসিকদের মত। এরপর বৈদিকগণ কৃষিকাজ শিখে স্থায়ী জীবনযাপন শুরু করলে পরবর্তীকালে তারাও নগরসভ্যতার পত্তন করেন। হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে তাদের বিরোধ বেদের বেশ কিছু সূক্তে লক্ষ করা যায়। এ সম্পর্কে সুকুমারী ভট্টাচার্য বলেছেন-

"আর্যরা এদেশে আসবার পরে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও সমাজ-গঠন কী রকম ছিল তা জানবার মতো উপাদান আমাদের হাতে বেশি নেই। সিন্ধুসভ্যতার জনপদগুলি থেকে প্রাগার্য অধিবাসীদের যুদ্ধে হারিয়ে বা হঠিয়ে দিয়ে আর্যরা যখন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে প্রথম বসবাস করতে শুরু করল, তখনও তাদের জীবনযাত্রা প্রধানত পশুচারণের ওপর নির্ভর করত। প্রাগার্যদের কাছে হয়তো তারা চাষের কাজ অল্প সময়েই শিখে নিয়েছিল। কিংবা জুলুম করে প্রাগার্যদের ফসল কেড়ে নিয়ে ভোগ করত।"[৩]

বৈদিকগণ স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার পর, তারা গ্রামীণ কৃষিসভ্যতা থেকে ধীরে ধীরে বেড়িয়ে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। রাজার প্রয়োজনে গড়ে ওঠে প্রাসাদ এবং এভাবেই বহু জনসমাগমের দ্বারা উন্নত জীবনযাপনে অভ্যস্ত হতে শুরু করে। শুরু হয় নগরায়নের। এভাবেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কালে মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাস্তু বা বাড়ি, নগর বা মন্দির নির্মাণের যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তাতে সমাজ সচেতন কবিদের ভাবনায় পরিবেশ সম্পর্কিত যে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। তবে একথা ঠিক বর্তমান অর্থে যে নগরায়ণ তার পরিচয় সেসময়ে ছিল না। কবিগণ বাড়ি-ঘর নির্মাণের প্রতিও সেভাবে দৃষ্টিপাত করেননি। যেহেতু এসব সাহিত্য মূলত ধর্মীয় বোধের দ্বারা পরিচালিত তাই মন্দির নির্মাণের প্রসঙ্গ অবধারিত ভাবে চলে এসেছে। তবে নগরায়নের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক কিন্তু ব্যস্তানুপাতিক। নগরের বিকাশে পরিবেশ ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়। যা বর্তমান যুগ চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে। আধুনিক নগরজীবন পরিবেশের তোয়াক্কা না করে শুধু ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তায় মগ্ন হয়ে অদূরদর্শীতার পরিচয় দিচ্ছে। আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ঠেলে দিচ্ছে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। হরপ্পা সভ্যতার বিনাশের একটি কারণে বলা হয়, পোড়া ইঁটের ব্যবহার অত্যন্ত বেড়ে যাবার ফলে প্রচুর বনাঞ্চল ধ্বংস হয়। তার ফলশ্রুতিতেই নাকি অনাবৃষ্টির ফল সেই সভ্যতার পতন। কিন্তু মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেখা যায় মন্দির নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশই বদলে দিয়েছেন কবিগণ।

আধুনিক অর্থে পরিবেশভাবনা বলতে যা বোঝায় মধ্যযুগের সাহিত্যে তথা মঙ্গল কাব্যে তার যথাযথ প্রকাশ থাকবে না, এটাই স্বভাবিক। পরিবেশ সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা শুরুই হয়েছে শিল্পবিপ্লবের করালমূর্তি প্রকাশিত হবার পর। বিশেষত বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই চিন্তাভাবনা দ্রুততার সঙ্গে বেড়েছে। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে রাচেল কারসনের 'Silent spring' প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি কীটনাশক ব্যবহারের ফলে আমাদের ভবিষ্যৎ অবক্ষয়িত ভাবনাকে ব্যক্ত করে। গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার জনমানসে ভীষণ ভাবান্তর দেখা যায়। একদিকে ডি.ডি.টি. আবিষ্কারকের নোবেল প্রাপ্তি অন্যদিকে রাচেল কারসনের ভয়াবহ বিবরণ। শেষ পর্যন্ত আমেরিকা এই কীটনাশকের কুফল পর্যবেক্ষণ করে এর ব্যবহার বন্ধ করে ঠিকই কিন্তু পরিবেশ সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনার আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। ১৯৭২, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের সম্মেলনগুলিতে তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং হাল আমলের পরিবেশ সম্পর্কিত ভাবনা যদি আমরা মধ্যযুগের

মঙ্গলকাব্যগুলিতে খুঁজতে যাই তাহলে তা বৃথা যাবে। কিন্তু মানুষ প্রকৃতির সন্তান, এখানেই তার জন্ম, মৃত্যু, বেড়ে ওঠা। ফলে প্রকৃতি-পরিবেশ সম্পর্কে তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তাদের রচিত সাহিত্যে ছাপ ফেলবে না তা হতে পারে না। তাই আধুনিক পরিসরে পরিবেশভাবনা বলতে যা বোঝায় তা সেসময়ের সাহিত্যে পাওয়া না গেলেও তাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় লালিত পরিবেশ ভাবনা অবশ্যই পাওয়া যায়।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে নগর নির্মাণ খুব বেশি পাওয়া যায় না। তবে ছোট পরিসরে মন্দির নির্মাণ কিংবা পুরী নির্মাণ অংশে পরিবেশ চেতনার বাস্তববোধকে ধরা যায়। যেসব কাব্যে নির্মাণ প্রসঙ্গগুলি পাওয়া যাচ্ছে সেগুলি হল-

ক. মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে কলিঙ্গ নগরে দেবীর মন্দির নির্মাণ।

খ. মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে কালকেতুর গুজরাটনগর পত্তন।

গ. দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' কাব্যে চণ্ডীর মন্দির নির্মাণ।

ঘ. দ্বিজ রামদেবের 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যে দেবীর মন্দির নির্মাণ।

ঙ. ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে 'অন্নপূর্ণাপুরী নির্মাণ'।

চ. বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে সিজুয়া পর্বতে মনসার পুরী নির্মাণ।

মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে দেবী মূলত চাঁদসদাগরের পূজা প্রত্যাশী। তাই মন্দির নির্মাণের সেরকম কোনো ইচ্ছা প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলের দেবী সমাজে কম প্রচলিত হলেও মানুষের কাছে পরিচিত। ফলে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শুরুতেই দেবীর মন্দির নির্মাণের বিষয়টি লক্ষ করা যায়। মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে পদ্মার উপদেশে দেবী চণ্ডী বিশ্বকর্মাকে কলিঙ্গ নগরে মন্দির নির্মাণ করবার নির্দেশ দেন। বিশ্বকর্মাকে নির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দেন কলিঙ্গনগরে- 'কংসনদকূলে' 'তমালতরুমূলে' মন্দির নির্মাণ করতে। মন্দিরের পাশেই হনুমান 'নখে কোরে' সরোবর সৃষ্টি করেন। সরোবরের চার দিকে বাঁধ দিয়ে 'বিশাই রচিল উদ্যান'। উদ্যান ফল, ফুল, লতা ইত্যাদি নানাজাতীয় গাছে ভরিয়ে দিলেন।

> "রসাল পনস রম্ভা রূপিল হনুমান।
> তাল নারিকেল গুয়া দাড়িম্ব খাজুর
> করুণা কমলা টাবা নারেঙ্গ বীজপুর।
> নেহালি বান্ধুলি চাঁপা টগর তুলসী
> রঙ্গন মালিতি জাতি সিঅলি অতসী।
> সতবর্গ মালতি জুথি কুন্দ কুরুবক
> পদ্ম বাকস ঝিটী পারুলি অশোক।
> রাত্রি দিন জাগরূক পবননন্দন
> মলয়া লুটিয়া আনি রূপিল চন্দন।"[৪]

শুধুমাত্র মন্দির নির্মাণই নয় হনুমান রাত-দিন জেগে গাছ লাগিয়ে তার পরিচর্যায় ব্যস্ত- "রাত্রি দিন জাগরূক পবননন্দন"। মানুষ তার প্রয়োজনে অরণ্য ধ্বংস করেছে যুগ যুগ ধরে। গুজরাট নগর স্থাপনের সময়ে 'গুজরাট বন' ধ্বংসের চিত্র আমাদের বিচলিত করে ঠিকই কিন্তু ধ্বংসের মধ্যেও থাকে সৃষ্টির বীজ। গুজরাট নগর স্থাপনার জন্য বিস্তীর্ণ অরণ্য অঞ্চল ধ্বংসের মুখে পড়েছে। কিন্তু অরণ্য অঞ্চলকে নির্মূল করে দেওয়া হয়নি। প্রয়োজন মতো বৃক্ষরাজিকে বাঁচিয়ে রাখার দৃষ্টান্তও লক্ষ করা যায়। কালকেতুর পাহারায় বন কাটা শুরু হয়। নানা জাতির বৃক্ষ কর্তনের তথ্য আমাদের ব্যথিত করে। কিন্তু শেষ পর্যায়ে দেখা যায় কালকেতু সমগ্র অঞ্চলকে বৃক্ষহীন করলেন না। প্রয়োজনীয় প্রচুর গাছকে তিনি রেখে দিলেন। এখানেই ঘটনাটির সার্থকতা। তিনি চাইলেই অঞ্চলটিকে বৃক্ষহীন করে ঊষর ভূমিতে পরিণত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করলেন না। আসলে তিনি জানতেন বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা, তাই-

> "কাঁটাল কদলি রাখিল গুআ
> অশ্বত্থ রাখিল মূল বান্ধিয়া

রাখিল রুদ্রাক্ষ জায়ফল লবঙ্গা।
মালতী মল্লিকা নাহালী চাঁপা
ভুজঙ্গকেসর রাখিল জবা
টকর তুলসী রাখিল রাঙ্গন
করুণা কমলা ছোলঙ্গ টাবা
তাল নারীকেল নগরে শোভা
শঙ্কর পূজিতে রাখিল বেলবন।
বটতরু রাখিল ষষ্ঠীর ধাম
মহাতরু রাখিল জনবিশ্রাম
মূল বান্ধিল আনিআ থৈকর"[৫]

অর্থাৎ শুধুমাত্র অরণ্যনিধন নয় অতি প্রয়োজনীয় গাছগুলিকে না কাটবার প্রসঙ্গও দেখতে পাচ্ছি। নগরের শোভাবর্ধন, জনবিশ্রাম কিংবা দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত গাছগুলিকে রক্ষা করবার কথা বলেছেন। এমনকি কিছু গাছের গোড়া রাজমিস্ত্রি (থৈকর) দিয়ে বাঁধিয়ে রাখার কথাও বলা হল। যে গাছগুলি রাখা হল তাদের প্রয়োজনটাও জানিয়ে দিয়েছেন কবি। শিব পূজার জন্য বেল গাছ, ষষ্ঠীর জন্য বট গাছ, মানুষের বিশ্রামের জন্য বিভিন্ন বৃহৎ গাছ এমনকি গাছের গোড়াগুলি পর্যন্ত বাঁধিয়ে রাখলেন। এছাড়াও বিভিন্ন ফুল, খাদ্যের জন্য ফল, নগরের শোভার জন্য তাল নারিকেল গাছগুলিকে সংরক্ষণ করা হল। মানুষের সঙ্গে উদ্ভিদের সম্পর্কের গভীরতা অনেক। আধুনিক জ্ঞানের চর্চা না থাকলেও তাদের ব্যবহারিক জ্ঞান কোনো অংশে কম ছিল না। তাই কাব্যগুলির পরতে পরতে বৃক্ষ রক্ষার সংবাদ আমাদের উল্লসিত করে।

দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' কাব্যেও 'বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক কংস-নদীর তটে দেউল নির্ম্মাণ' অংশে পদ্মাবতীর পরামর্শে দেবী বিশ্বকর্মা ও হনুমানকে 'গুয়াপান' ভেট দিয়ে আদেশ করেন কংসনদীর কুলে মন্দির নির্মাণ করতে। দেবীর আদেশ পাওয়া মাত্র তারা পাথর, প্রবাল, মুক্তা, রজত-কাঞ্চন দ্বারা 'লৌহময়' মঠ স্থাপন করলেন। সঙ্গে মন্দিরের পাশে তৈরি করলেন পুষ্পোদ্যান-

"বিশাই কৈল পুষ্পোদ্যান   ডীঘি দিল হনুমান
কমল রুঞিল তার জলে।"[৬]

দেবীর মন্দির প্রস্তুত। মন্দিরের পাশেই উদ্যানও প্রস্তুত। আসলে দেবীকে পুজো দেবার জন্য পর্যাপ্ত ফুল প্রয়োজন, ফল প্রয়োজন। ভক্তদের অবস্থানের জন্য ছায়া প্রয়োজন, প্রক্ষালনের জন্য জল প্রয়োজন। এসব নানা কারণ নির্মাণ কর্তাদের জানা ছিল। তাই উদ্ভিদের নানা অবদান জলাশয়ের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন মানুষ মন্দিরের পাশে সবসময় উদ্যান এবং পুকুর স্থাপন করতেন। মানুষের প্রয়োজনে পরিবেশ চিরকাল নিজের ডালা সাজিয়ে রেখেছে। তবুও নির্মাণ কাজের ফলে কৃত্রিমভাবে পরিবেশকে নিজের ব্যবহারে লাগিয়েছে মানুষ। মন্দির, উদ্যান, সরোবর শুধু নয়-

"হংস কুম্ভীর দেখি   চকোর চাতক পক্ষী
কোকিল কুহরে চূত ডালে।"[৭]

অর্থাৎ সরোবরে হাঁস এবং কুমীর দেখে পাখিদের চিৎকারের মধ্যে আসলে খাদ্যজাল লুকিয়ে রয়েছে। জলজ কিছু প্রাণি যারা অন্য প্রাণিদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে সে বিষয়টিকে কবি সুন্দরভাবে ছুঁয়ে গেছেন। অন্যদিকে আরো বলেছেন-

"এক কালে সর্ব্ব তরু   নানা ফল ধরে চারু
তিথি পুষ্প অতি মনোরম।
ভক্ষ্য ও ভক্ষকে তথা   কৌতুকে কহেন কথা
কারে কেহ না করে হিংসন।।"[৮]

ভক্ষ্য এবং ভক্ষকের কথা বলেছেন। কিন্তু তাদের মধ্য অহিংসার সম্পর্কটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে।

দ্বিজ রামদেবের 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যেও 'কংসসরোবর'এর তীরে দেবীর মন্দির নির্মাণ হতে দেখি। সেখানেও কবি মন্দিরের পাশাপাশি নির্মাণ করেছেন উদ্যান। উদ্যান নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে দেবী সেখানে অবতরণ করলেন। সরোবর পরিদর্শন করলেন। সে উদ্যান নানারকম বৃক্ষে ভরপুর- 'কুমুদ', 'কহ্লার', 'কমল', 'রক্ত উৎপল', 'লবঙ্গ', 'গন্ধরাজ', 'করবী', 'কেতকী', 'যুতি', 'জাতি', 'দলা' (দ্বিজ রামদেব/৩০-৩১)। কবি শুধু মন্দির, পুকুর, গাছের কথা বলেই ক্ষান্ত হননি তিনি সেই সেই পুকুরের সে সময়ের প্রেক্ষিতে একটি বাস্তুতন্ত্রের বর্নণা দিয়ে ফেলেছেন-

"চকিত চক্রবাক ছাড়য়ে ঘন ডাক
বলাকা উড়ে মনোরঙ্গে।
লইয়া মীন রঙ্গে সঙ্গে চরে কঙ্কে
কারণ্ড চরে তার সঙ্গে।।
চরএ রাজহংসে চাতকে লইয়া বংশ
চকোরে ডাকে মনোহর।
তমাল তরুতাল লবঙ্গ গোলাল
পঞ্চম গাএ পিকবর।।"[৯]

সুতরাং কবি মন্দিরসহ সেই এলাকাটির একটি পরিবেশতান্ত্রিক পরিস্থিতিকে তুলে ধরেছেন। জলের ভেতরে অবস্থানরত বিভিন্ন অণুজীবের পরিচয় আমরা আধুনিক যুগে এসে জানতে পেরেছি। কবিও সে বিষয়ে অভিজ্ঞ নয়। ফলে বাইরের দৃশ্যমান জগতকেই কবি তার কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন অভিজ্ঞতার আকরে। তাই মাছ, পাখি, স্থলজ গাছ, জলজ গাছ মিলিয়ে যে পরিবেশ তিনি বর্ণণা করেছেন সেখানে খাদ্য খাদকের সম্পর্কটিও ফুটে উঠেছে। এবং খাদ্য খাদকের সম্পর্কের মধ্য নিহিত রয়েছে পুষ্টিচক্র এবং শক্তিপ্রবাহ। কবি নিশ্চয়ই এসব পরিভাষা জানতেন না। নিজের অজান্তেই আধুনিক বিজ্ঞানবোধের ভাবনাকে ব্যক্ত করে ফেলেছেন।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে শিব বিশ্বকর্মাকে বলেন 'দেউল দেহ বনাই'। শুনে বিশ্বকর্মা এক অপূর্ব পুরী নির্মাণ করলেন, যা দেখে 'সুখী কৃত্তিবাস'। পুরীর চারিদিকে প্রাচীর এবং সামনে স্থাপন করলেন 'সরোবর মনোহর'। সরোবরের ঘাট সুন্দর করে বেঁধে দিলেন বিভিন্ন মূল্যবান রত্ন দ্বারা। পুরী ও সরোবর স্থাপন করে রচনা করলেন উদ্যান, যাতে নানা জাতের বৃক্ষ রোপণ করলেন তিনি। ভারতচন্দ্র তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন-

"চারি পাড়ে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মায় উদ্যান।
নানা জাতি বৃক্ষ গড়ে সুন্দর বন্ধান।।
অশোক কিংশুক চাঁপা পুন্নাগ কেশর।
করবীর গন্ধরাজ বকুল টগর।।
শেহলী পীয়লী দোনা পারুল রঙ্গন।
মালতী মাধবীলতা মল্লিকা কাঞ্চন।।
জবা জুতী জাতী চন্দ্রমল্লিকা মোহন।
চন্দ্রমণি সূর্য্যমণি অতি সুশোভন।।
কনকচম্পক ভূমিচম্পক কেতকী।
চন্দ্রমুখী সূর্য্যমুখী অতসী ধাতকী।।
কদম্ব বাকস বক কৃষ্ণকেলি কুন্দ।
পারিজাত মধুমল্লী ঝিঁটী মুচকুন্দ।।
আম জাম নারিকেল জামির কাঁটাল।

খাজুর গুবাক শাল পিয়াল তমাল।।
হিজোল তেঁতুল তাল বিল্ব আমলকী।
পাকুড় অশ্বত্থ বট বালা হরিতকী।।
ইত্যাদি বিবিধ বৃক্ষ ফুলফলধর।"[১০]

কবি শুধুমাত্র এইসব গাছেদের কথা বলে শেষ করেননি, এসব গাছে বসবাসকারী পাখিদের কথাও বলেছেন-

"ময়না শালিক টিয়া তোতা কাকাতুয়া।
চাতক চকোর নুরী তুরী রাঙ্গচুয়া।।
ময়ূর ময়ূরী সারী শুক আদি খগ।
কোকিল কোকিলা আদি রসাল বিহগ।।
সীকরা বহরী বাসা বাজ তুরমুতী।
কাহাকুহী লগর ঝগর জোড়াধুতী।।
শকুনী গৃধিনী হাড়গিলা মেটেচিল।
শঙ্খচিল নীলকণ্ঠ শ্বেত রক্ত নীল।।
ঠেটী ভেটী ভাটা হরিতাল গুড়গুড়।
নানাজাতি কাক পেঁচা বাবুই বাদুড়।।
বাকচা হারীত পারাবত পাকরাল।
ছাতারিয়া করকটে ফিঙ্গা দহিয়াল।।
চড়ই মণিয়া পাবদুয়া টুনটুনি।
বুলবুল জল আদি পক্ষী নানা গুণি।।"[১১]

পাখি ছাড়াও "ভীমরুল ডাঁশ মশা বোরলা প্রভৃতি"[১২] কথা বলতে ভুলে যাননি। ভোলেননি বিভিন্ন স্থলচর পশুদের বর্ণনা দিতেও-

"সরভ কেশরী বাঘ বারণ গণ্ডার।
ঘোড়া উঠ মহিষ হরিণ কালসার।।
বানর ভালুক গরু ছাগল শশারু।
বরাহ কুক্কুর ভেড়া খটাস সজারু।।
ঢোলকান খেঁকি খেঁকশিয়ালি ঘোড়ারু।
বারশিঙ্গা বাওটাদি কস্তুরী তুলারু।।
গাধা গোধা হাপা চাউ চমরী শৃগাল।
হোড়ার নকুল গৌলা গবয় বিড়াল।।
কাকলাস ধেড়ে মূসা ছুঁচা আজনাই।
সৃষ্টি হেতু জোরে জোড়ে গড়িলা বিশাই।।"[১৩]

বলেছেন বিভিন্ন সাপের কথা-

"কেউটে খরিশ কালীগোখুরা ময়াল।
বোড়া চিতি শঙ্খচূর সূঁচে ব্রহ্মজাল।।
শাঁখিনী চামর কোষা সূতার সঞ্চার।
খড়ীচোঁচ অজগর বিষের ভাণ্ডার।।
তক্ষক উদয়কাল ডাঁড়াশ কানাড়া।
লাউডগা কাউশর কুয়ে বেতাছাড়া।।

চাতারে শীয়রচাঁদা নানাজাতি বোড়া।
ঢেমনা মেটেলী পুঁয়ে হেলে চিতী ঢোঁড়া।।
বিছা বিছু পিপিড়া প্রভৃতি বিষধর।
সৃষ্টিহেতু জোড়ে জোড়ে গড়িল বিস্তর।।"[১৪]

মন্দিরের সামনে যে সরোবর খনন করা হয়েছে তাতে নানা প্রকার জলচর পাখির কথা বলেছেন ভারতচন্দ্র-

"নানা পক্ষী জলচর গড়ে নানা ভাতি।।
ডাহুকা ডাহুকী গড়ে খঞ্জনী খঞ্জন।
সারসা সারসী গড়ে বক বকীগণ।।
তিত্তিরী তিত্তিরা পানিকাক পানিকাকী।
কুরলী কুরল চক্রবাক চক্রবাকী।।
কাদাখোঁচা দলপিপী কামি কোড়া কঙ্ক।
পানিতর বেণেবউ গড়ে মৎস্যরঙ্ক।।"[১৫]

বলেছেন নানা জাতিয় জলজ প্রাণিদের কথাও-

"হাঙ্গর কুম্ভীর গড়ে শুশুক মকর।"[১৬]

বলেছেন নানা প্রকার মাছেদের কথা-

"চীতল ভেকুট কই কাতলা মৃগাল।
বানি লাটা গড়ুই উলকা শৌল শাল।।
পাঁকাল খয়রা চেলা তেচক্ষা এলেঙ্গা।
গুতিয়া ভাঙ্গন রাগি ভোলা ভোলচেঙ্গা।।
মাগুর গাগর আড়ি বাটা বাচা কই।
কালবসু বাঁশপাতা শঙ্কর ফলই।।
শিঙ্গী ময়া পাবদা বোয়ালি ডানিকোনা।
চিঙ্গড়ী টেঙ্গরা পুঁটি চান্দাগুঁড়া সোনা।।
গাঙ্গদাড়া ভেদা চেঙ্গ কুড়িশা খলিশা।
খরশুল্লা তপসিয়া গাঙ্গাস ইলিশা।।"[১৭]

সুতরাং এখানে একদিকে অরণ্য অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে একটি সরোবরের বাস্তুতন্ত্রের ছবি আমরা দেখতে পাই।

বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে সিজুয়া পর্বতে মনসাদেবীকে ছেড়ে আসে মহাদেব। সে পর্বত সিজ বৃক্ষে পূর্ণ- "চারিদিগে প্রকাশিত রম্য সিজ তরু। সুন্দর শীতল ছায়া পরম সুচারু।।"[১৮] মনসা সেই সিজবৃক্ষের তলায় অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়লে শিব পালিয়ে চলে আসে। সেখানে রেখে আসে নেতো এবং ধামাইকে। মনসা, নেতো এবং ধামাই এরপর সেখানেই পুরী নির্মাণের আদেশ দেন বিশ্বকর্মাকে। বিচিত্র মণি, মুক্তা, পাথর দিয়ে মনসার পুরী স্থাপন শেষ হয়। 'ছত্রিশ জাতি' মানুষের সমাগম হয় সেখানে এবং আনন্দে বসবাস করতে থাকে। প্রতিটি বাড়ির সামনে কলাগাছ এবং নানাবিধ ফুলগাছ রোপণ করা হয়েছে-

"প্রতি-দ্বারে চারু রুপি রম্ভাতরু
তথি শোভে নানা ফুলে।"[১৯]

নগরের কাছেই রয়েছে সরোবর। সেই সরোবরের চারিদিকে প্রচুর বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে-

"চৌদিগে অবিশাল রসাল ফলে তাল
পনস চ্যুত নারিকেল।

সুগন্ধি পুষ্পবন   অপূর্ব রচন
ভ্রমর পিকু কোলাহল।।"[২০]

সেই সরোবরে বিচরণরত বিভিন্ন পাখিদের কথা বলেছেন কবি-

"কত রাজহংস   কারণ্ড অবতংস
সরল কুরল সকল।
চকোয়া অবিশাল   ডাহুকা সামুখাল
কোড়া কামি গাড়াপোল।।
সারস বক কঙ্ক   সরালি মৎস্যবঙ্ক
শঙ্খচিল উড়ি বুলে।
তিথির ময়ূর   বিহগ প্রচুর
চরন্তি সরোবরকুলে।।"[২১]

রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' কাব্যেও 'অথ ধর্ম্মপূজা' অংশে নিরঞ্জন পূজার জন্য হনুমানকে ডেকে পুকুর নির্মাণ করান। ঘাট বাঁধিয়ে এখানেও উদ্যান স্থাপন লক্ষ করা যায়- 'কদম্ব বকুল রূপি নানা ফুল'।[২২] শুধু তাই নয় এখানেও সরোবরকে কেন্দ্র করে একটি বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশ এঁকেছেন কবি। যেখানে 'শিখি', 'রাজহাঁস', 'চাতক', 'চাতকী', 'ডাক', 'খঞ্জন' পাখি সহ নানান গাছের উল্লেখ লক্ষ করা যায়। রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের শিবায়ন কাব্যে হরগৌরীর বাসরযাপনের জন্য হিমালয় যে পুরী নির্মাণ করে দান করেছেন সেখানেও পুরীর অভ্যন্তরে সরোবর এবং উদ্যানের অবস্থান লক্ষ করা যায় "সুবর্ণে রচিত ঘাট দিব্য সরোবর। নানাজাতি পুষ্প ফুটিয়াছে তার কুলে"[২৩]। মন্দার পর্বতে শঙ্করের পুরী কিংবা বাণ নির্মিত 'গৌরী শঙ্করের পুরী'[২৪] অংশেও বন, উপবন নির্মাণের প্রসঙ্গে বাস্তুতন্ত্রের ইঙ্গিত রয়েছে। আসলে মানুষ যাই করুক না কেন পরিবেশ-প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে তারা কিছু ভাবতে পারেনি।

সুতরাং নগর নির্মাণ মঙ্গলকাব্যগুলিতে সেভাবে পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র কালকেতুর গুজরাটনগর পত্তন ছাড়া। কিন্তু মন্দির নির্মাণ বিষয়ে কবিগণ সিদ্ধহস্ত। মন্দির নির্মাণ কাহিনীর প্রয়োজনে হলেও সে প্রসঙ্গে আনুসঙ্গিক বর্ণণাগুলিতে কবিগণের স্বকীয়তা প্রকাশ পেয়েছে। প্রকাশ পেয়েছে তাদের বাস্তববোধ। এই বাস্তবোধের ভেতরেই নিহিত রয়েছে পরিবেশভাবনার বীজ। মন্দির নির্মাণ অংশগুলি পাঠ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে স্থাপন করা হচ্ছে একটি সরোবর। প্রত্যেকটি মন্দিরের সম্মুখভাগে একটি সরোবর স্থাপনের দ্বারা মানুষের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা কাজ করছে। জলের প্রয়োজন সম্পর্কে মানুষ সচেতন ছিল পুরাতন কাল হতেই। আমরা প্রাচীন সভ্যতাগুলির উত্থান পতন ঘটতে দেখি এই জলের (নদী) ধারেই। ফলে মানুষ আবহমানকাল ধরে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে। তাই ব্যবহারিক প্রয়োজনে জল সংরক্ষণ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সরোবরকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা হচ্ছে উদ্যান। বিচিত্ররকম বৃক্ষের দ্বারা সেই উদ্যান সাজানো হচ্ছে। ফলের গাছ, ফুলের গাছ, কাষ্ঠল জাতিয় গাছ, ওষধি ইত্যাদি। কেন? অবশ্যই প্রয়োজনে, গাছ আমাদের খাদ্য দেয়, ছায়া দেয়, জ্বালানি দেয়, সৌন্দর্যবর্ধন করে আরো নানা কারণে গাছের ব্যবহারিক গুরুত্ব অপরিসীম। এদের আশ্রয় করে প্রচুর জীব বেঁচে থাকে। প্রাচীন পুরাণ তথা সাহিত্যগুলিতে যেখানে গাছকে সন্তানরূপে পালন করতে বলেছেন তার একটা প্রভাব অবশ্যই জনমানসে থাকবে সন্দেহ নেই। তাই গাছ অক্সিজেন দেয়, যা ছাড়া কোনো জীবই বাঁচতে পারবে না এ তথ্য তাদের জানা না থাকলেও গাছের প্রতি মানুষের ভালোবাসা অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। মঙ্গলকাব্যগুলি তার ব্যতিক্রম নয়। মন্দিরের সামনে সরোবর তাকে বেষ্টন করে উদ্যান। এখানেই কবি থেমে যাননি সেই উদ্যান তথা অরণ্য অঞ্চলে প্রতিপালিত নানা প্রকার পাখি, জীবজন্তু, পোকামাকড়ের কথাও বলেছেন। যারা পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। ইকোসিস্টেমের সবটা কবিগণের জানা না থাকলেও দৃশ্যায়মান সিস্টেমটিকে তারা যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন। একই ভাবে সরোবরের মধ্যেও জলজ পাখি, মাছ, পোকামাকড়, জলজ প্রাণিদের কথা

বলেছেন। যেখান থেকে অনায়াসেই খাদ্য শৃঙ্খলের অনেকগুলি পিরামিড নির্মাণ করা সম্ভব। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের কবিগণ সচেতনভাবেই এই বর্ণনা দিয়েছেন সেখানে তাদের পরিবেশভাবনাগুলি ফুটে উঠেছে।

তথ্যসূত্র :

১. আসাদুজ্জমান, আলহাজ্ব মোঃ, নগর সমাজ বিজ্ঞান, প্রথম প্রকাশ, কবির পাবলিকেশনস, ঢাকা, ২০১৩-১৪, পৃ. ৩৩
২. দাশগুপ্ত, সমীর, অর্থনৈতিক সমাজতত্ত্ব, প্রথম প্রকাশ, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ২৫৭
৩. ভট্টাচার্য, সুকুমারী, প্রাচীন ভারত, নবম মুদ্রণ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১৩
৪. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত), কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত 'চণ্ডীমঙ্গল', সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ২৮-২৯
৫. ঐ, পৃ. ৭০
৬. ভট্টাচার্য্য, সুধীভূষণ (সম্পাদিত), দ্বিজ মাধব বিরচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৫, পৃ. ২৬
৭. ঐ, পৃ. ২৬
৮. ঐ, পৃ. ২৬
৯. দাস, আশুতোষ (সম্পাদিত), দ্বিজ রামদেব বিরচিত অভয়ামঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২, পৃ. ৩০
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত), ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৪২৫, পৃ. ১০২ - ৩
১১. ঐ, পৃ. ১০৩
১২. ঐ, পৃ. ১০৩
১৩. ঐ, পৃ. ১০৪
১৪. ঐ, পৃ. ১০৪
১৫. ঐ, পৃ. ১০২
১৬. ঐ, পৃ. ১০২
১৭. ঐ, পৃ. ১০২
১৮. বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পাদিত), বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ২৬৯
১৯. ঐ, পৃ. ২৭২
২০. ঐ, পৃ. ২৭২
২১. ঐ, পৃ. ২৭২
২২. ভট্টাচার্য, আনন্দ (সম্পাদিত), রামাই পণ্ডিত বিরচিত শূন্যপুরাণ, কে পী বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৩০০-৩০১
২৩. পাল, নিমাইচন্দ্র, (পরিচায়ক ও সংকলক), রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র বিরচিত শিবায়ন, সংযোজক প্রাণকৃষ্ণ মাজী ও রাজী চক্রবর্তী, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, কলকাতা, ১৪১৯ পৃ. ১৪১